সাদি মহম্মদ ও একটি মৃত্যু রহস্য

মাধবী লতা

সাদি মহম্মদের জন্ম ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে।

২০০৭ সালে 'আমাকে খুঁজে পাবে ভোরের শিশিরে' অ্যালবামের মাধ্যমে তিনি সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

২০১২ সালে তাকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করেছে চ্যানেল আই। ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি দিয়েছে রবীন্দ্র পুরস্কার।

অক্টোবর ৪, ১৯৫৭ - মার্চ ১৩, ২০২৪

১.

একজন মানুষ মারা যাচ্ছেন। তার পিঠে ছুরি মারা হয়েছে। গভীর ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। যেই লোকটি মারা যাচ্ছেন তার নিজের ছেলে বাবার ক্ষতস্থান ধরে বসে আছে। হাতের তালু দিয়ে আটকানো যাচ্ছে না রক্তস্রোত। বাবার শরীরের গরম রক্ত ছেলের হাতের আঙুলের ফাঁক গলিয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। শুকনো মাটি শুষে নিচ্ছে বাবার রক্ত। ছেলেটি চিৎকার করছে। তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে বাবাকে বাঁচানোর আকুতি। বার বার মনে হচ্ছে হাসপাতালে নিতে পারলেই বাবা বেঁচে যেতেন! কিন্তু আর হাসপাতালে নেওয়া হয় না। বাবা বলেন, 'আমার মাথাটা কেমন যেন ঘোরাচ্ছে। আমাকে একটু খোলা জায়গায় নিয়ে যা।' ছেলে বাবার শেষ ইচ্ছে পূরণ করছে, বাবাকে ওখান থেকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে খোলা রাস্তায়। তখনও পিঠের ক্ষত থেকে অনবরত রক্ত বের হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাবা মারা যাবেন, কিন্তু বাবার জীবনের শেষ সময়েও তার পাশে বসে থাকতে পারে না ছেলে! কারণ তাকেও হত্যা করার জন্যও ছুটে আসছে আরও তিন চারজন। সবার হাতে বড় বড় ছুরি। ঠিক এই সময় বাবা বলেন, 'তুই আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যা। আমি তো মরতেছি। তুই অন্তত বেঁচে থাক।'

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডের সি-১২/১০ নম্বর বাড়িতে। ওই রাস্তার উপর বিহারিদের হাতে শহীদ হয়ে যাওয়া মানুষটির নাম শহীদ সলিম উল্লাহ। মোহাম্মদপুরের একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। আর শহীদ সলিম উল্লাহর ক্ষত চেপে ধরে বসে থাকা ছেলেটির নাম সাদি মহম্মদ। সেদিন বাবার সঙ্গে নিজের প্রাণটিও বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সাদি। কিন্তু বাবার অনুরোধেই পালিয়ে বাঁচেন তিনি। দেখা হয় মায়ের সঙ্গে। সলিম উল্লাহর পরিবার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে তাদের সখ্যতা ছিল, এটাই ছিল তাদের অপরাধ! ৭১-এর ২২ মার্চ রাতে নিজেদের বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিলেন সাদিরা। সেদিন থেকেই অবাঙালিদের সরাসরি টার্গেটে পরিণত হন তারা। এভাবেই দেশকে ভালোবেসে শহীদ হলেন সাদি মহম্মদের বাবা। মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ কবরস্থানে শায়িত আছেন তিনি।

২.

অন্যদিকে মা হাঁটতে পারছেন না। তার পা ভেঙে গেছে। পেছনে শত্রু তাড়া করেছে, এদিকে মায়ের পা ভাঙা। কীভাবে মাকে বাঁচাবেন সাদি! সেই সময় এক বিহারি ছেলে তাদের সহযোগিতা করে পালাতে। এই সহযোগিতা করার অপরাধে পরের মাসে ১৭-১৮ তারিখে সেই বিহারি ছেলেটিকেও গুলি করে মেরে ফেলা হয়। একাত্তরের এসব অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি বহন করেই এত বছর বেঁচেছিলেন সাদি মহম্মদ। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভলোবাসা জানিয়ে শেষ করা সম্ভব না। যুদ্ধের পরে আরও এক জীবনযুদ্ধের মুখোমুখি হন তারা। সাদি মহম্মদরা ছিলেন ১০ ভাইবোন। তাদের মা জেবুন্নেসা সলিমউল্লাহ

মুক্তিযুদ্ধের পর সন্তানদের নিয়ে আরেক যুদ্ধ শুরু করেন। সাদি মহম্মদ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ওই সময় তিনি ও তার ভাই শিবলী মহম্মদ টিউশনি করে সংসারে সাহায্য করতেন। রবীন্দ্রসংগীতের এক কিংবদন্তি পুরুষ ছিলেন সাদি মহম্মদ। বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গনে ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। একাধারে একজন গায়ক, সুরকার ও সংগীতকর্মী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শিল্পী গড়ার কারিগরও। সবার প্রিয় এই শিল্পী সবাইকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন ২০২৪ সালের ১৩ মার্চ বুধবার। হঠাৎ কেন স্বেচ্ছায় সবাইকে ছেড়ে ওপারে পাড়ি জমালেন তিনি? তার মৃত্যু রহস্য আজানাই রয়ে গেল!

৩.

কিসের এতো আক্ষেপ ছিল সাদি মহম্মদের! এক জীবনে বাংলাদেশের সংগীত ভুবনকে যা কিছু দিয়ে গেলেন তার ঋণ কোনোদিনও পরিশোধ করা সম্ভব না। তার জীবন ও সংগীতযাত্রার একটা অনন্য গল্প আছে। সাদি মহম্মদের জন্ম ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে। সংগীতের সঙ্গেই ছিলেন আজীবন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসংগীতে স্নাতক হওয়ার পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও লাভ করেন। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ১৯৭৩ সালে বুয়েটে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। পারিবারিক কারণেই এ পদক্ষেপ। ভর্তি হয়েছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। কিন্তু সেখানে মন বসেনি। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াকালে ১৯৭৫ সালে স্কলারশিপ নিয়ে শান্তিনিকেতনে সংগীত নিয়ে পড়তে যান। সেই থেকে পথচলা সংগীতের সঙ্গে। নিয়মিত গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত। নানা গানের আসরের পাশাপাশি অ্যালবামও প্রকাশ করেছেন সাদি মহম্মদ। এরপর আবির্ভাব হন সুরকার হিসেবে। ২০০৭ সালে 'আমাকে খুঁজে পাবে ভোরের শিশিরে' অ্যালবামের মাধ্যমে তিনি সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ২০০৯ সালে তার 'শ্রাবণ আকাশে' ও ২০১২ সালে তার 'সার্থক জনম আমার' অ্যালবাম প্রকাশ হয়।এরপর ধীরে ধীরে সাদি মহম্মদ পরিণত হন বাংলাদেশের অন্যতম গুণী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীতে। তার ভাই শিবলী মহম্মদও নাচের কিংবদন্তি। ৫০-এর বেশি গানের অ্যালবাম প্রকাশ হয়েছে সাদির। সেইসঙ্গে নানা সময় বিদেশে গান গাইতে গিয়েছেন। করেছেন স্টেজ শো। সাংস্কৃতিক সংগঠন রবিরাগের প্রধান ছিলেন সাদি। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বহুজনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। আছেন অনেক শুভানুধ্যায়ী।

৪.

সাদি মুহম্মদ যেই মাপের শিল্পী ছিলেন সেই তুলনায় পুরস্কার অল্পই পেয়েছেন। ২০১২ সালে তাকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করেছে চ্যানেল আই। ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি দিয়েছে রবীন্দ্র পুরস্কার। সাদি মুহম্মদের মৃত্যুর পরে একটি পুরস্কারের ফরম সোশ্যাল মিডিয়াতে ভেসে বেড়াচ্ছে। অনেকেই লিখেছেন এই বিষয়ে। চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব বেলায়েত হোসেন মামুন বলেন, "সাদি মহম্মদকে 'একুশে' পদকের জন্য বিবেচনা করা যেত ২০০০ থেকে ২০১০ এর মধ্যেই, তিনি ওই সময়েই একুশে ডিজার্ভ করতেন। আর ২০১০ থেকে এই চলমান সময়ে ওনাকে 'স্বাধীনতা' পদকের জন্য মনোনীত করা উচিত ছিল। কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি। ওনার ছোট ভাই বরেণ্য নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষক শিবলী মহম্মদ এ বছর একুশে পেয়েছেন। অথচ ওনারই বড় ভাই কিংবদন্তিতুল্য শিল্পী, শিক্ষক সাদি মহম্মদকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এসব তো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। ক্ষমতার সিংহদুয়ারে যাদের নিত্য আনাগোনা তারা তো এসব বিষয়ে অজ্ঞান নন। কেননা, সাদি মহম্মদের সমসাময়িক কেউ কেউ একুশে ছাড়াও স্বাধীনতাপদকও অর্জন করে ফেলেছেন। তাদের কারো চেয়ে সাদি মহম্মদের কাজ ও অবদান যে বড় তা উল্লেখের দরকার পড়ে না। ভাববার বিষয় হলো, যে লোকটি জীবনের এই পর্বে এসে দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা ডিজার্ভ করেন, এমন লোকটিকে যখন 'শিল্পকলা পদক' এর জন্য বিবেচনা করা হয়, তখন সেই লোকটির কেমন অনুভূতি হয়? হয়ত, এই রকম অনুভূতির জন্যেই ৪/৫ মাস আগে শিল্পকলা পদকের ফরম পাঠানো হলেও তিনি তাতে সই করতে উৎসাহিত হননি। (শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ তথ্য ফেসবুকে এক পোস্টে উল্লেখ করেছেন)। অনেকবার অনুরোধ করার পর যখন তিনি সেই ফরমে সই করলেন তখন সই করার সাথে সাথে তিনি সেই ফরমের বেশ কয়েকটি 'ঘরে' ক্রস চিহ্ন দিয়ে কেটে দিয়েছেন। কেন কেটে দিয়েছেন? ফরমটি গভীরভাবে বিবেচনায় নিয়ে দেখার প্রয়োজন। কারণ, সাদি মহম্মদ যে দিন এই ফরমটি পূরণ করে স্বাক্ষর করেছেন ঠিক সেই দিনই ছিল ওনার অন্তিম দিন। ১৩ মার্চ। হয়ত, এই ফরমের স্বাক্ষরটিই ওনার শেষ স্বাক্ষর - আর এ কারণেই এ বিষয়টি মনোযোগ দাবি করে। ফরমের কয়েকটি ঘর উনি যেভাবে ক্রস করে কেটেছেন, তাতে ওনার মনোভাব বোঝা যায়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 'অবদানের' ঘর তিনি ক্রস করেছেন। কেন করেছেন? অবদান নেই না কি তা উল্লেখের এই দাপ্তরিক 'জিজ্ঞাসা'কে তিনি নাকচ করছেন? একইভাবে কেটেছেন আরও কয়েকটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ক্রস আমাকে ভাবিয়েছে। আপাতত এই ভাবনাগুলো এখানে লিখে এই লেখাটিকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। ভাবনাগুলো যে কারো মনে আসতে পারে যদি আপনারা এইদিকে একটু মনোযোগ দিতে আগ্রহী হন। আমি মনে করছি মনোযোগ দেওয়া দরকার। কথা হলো, কেন এই সময়ে এসে ওনাকে 'শিল্পকলা পদক' এর জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে? যখন তিনি দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা ডিজার্ভ করেন। এটা সাদি মহম্মদ সহজভাবে নেননি, তা ওনার ৪/৫ মাস এই ফরম স্বাক্ষর না করে ফেলে রাখা থেকেই অনুভব করা যায়। কিন্তু শিল্পকলা পদকের জন্য ওনাকে বিবেচনা করার বিষয়টিতে শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের কোনো অপরাধ আমি দেখি না। বরং আমি এতে শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের উত্তম অভিপ্রায়ই দেখতে পাই। শিল্পকলা একাডেমি শিল্পকলা পদকের জন্য গুণীজনদের মধ্যে যাঁরা অন্যান্য 'জাতীয়' পুরস্কার বা পদক এখনও পাননি তাদেরকে বিবেচনা করে বা অগ্রাধিকার দেয়। হয়ত, সাদি মহম্মদের নামও অন্যান্য জাতীয় পুরস্কার বা পদক তিনি এখনো পাননি বলেই শিল্পকলা একাডেমি পদকের জন্য চূড়ান্ত হয়েছে। কিন্তু এর অভিঘাত সাদি মহম্মদের জন্য শুভকর হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। শিবলী মহম্মদের বক্তব্যে জানা যায়, সাদি মহম্মদ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং অভিমানী ছিলেন। রাষ্ট্র সাদি মহম্মদের সাধনাকে মূল্যায়ন করেনি বা করছে না - এ অভিমান তাঁর ছিল। এ কথা শিবলী মহম্মদ বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। এসব কথা বিবেচনায় নিলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সাদি মহম্মদ মনে মনে মূল্যায়নহীনতার বেদনায় আহত ছিলেন। এছাড়া, স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের পরিবারের সাথে ঘটা ভয়াবহ ঘটনার বেদনা, ট্রমা তো তাঁর ছিলই? সবটা মিলেই তিনি এই রকম অবস্থায় চলে গেছেন যে - জীবনকেই বলেছেন বিদায়। আর তাঁর বিদায় বলার দিনটিতেই তিনি স্বাক্ষর করেছেন রাষ্ট্রীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা প্রাপ্তিপত্রে। কিন্তু সেই সম্মাননা গ্রহণের জন্য তিনি অপেক্ষা করতে চাইলেন না। যদি এই সম্মাননা তিনি গ্রহণের জন্য 'অপেক্ষা' নাই করবেন, তাহলে ঠিক ওই দিন এই ফরমে তিনি স্বাক্ষর কেন করলেন? জানি না এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে। একমাত্র যিনি এই উত্তর দিতে পারতেন তিনি চলে গেছেন আলোচনা-তর্কের সীমানা ছাড়িয়ে।"

৫.

সাদি মুহম্মদ ছিলেন অকৃতদার। বিয়ে করেননি তিনি। পরিবারে মা ছিলেন তার সব। ২০২৩ সালের ৮ জুলাই তার মা মারা যান। এরপর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সাদি। মা হারানোর বেদনা তাকে তাড়া করেছে প্রতিনিয়ত। এক সাক্ষাৎকারে সাদি বলেছিলেন, 'সবাই কেবল আমার বাবার কথা জানতে চায়। কিন্তু আমার মায়ের কথা কেউ জানতে চায় না। ৯৬ বছর বয়সে এখনো আমার মা বেঁচে আছেন, সেই ভয়াল স্মৃতি বুকে নিয়ে। সাদি মহম্মদও হয়তো অনেক স্মৃতি আর বেদনা বুকে নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।'

একবার কল্পনা করেন তো। সন্ধ্যে বেলা। আলো আঁধারিতে ঢাকা একটা ঘর। রবীন্দ্রসংগীত বাজছে। আর একটা মানুষ নিজেই তার মৃত্যুর আয়োজন করছেন। পর পর কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত শুনে, এক টুকরো রশির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। এত বড় মাপের একজন শিল্পীকে এমন ঝুলন্ত অবস্থায় মানায় না। আমরা আপনাকে অনেক ভালোবাসতাম। আপনি ঠিক করেননি কাজটা। আপনাকে প্রাপ্য সম্মান যারা দেয়নি তারাও ঠিক করেননি।